পুলিশি মালখানায় আলামত লোপাটের অভিযোগ, প্রশ্নের মুখে কর্তৃপক্ষ



মালখানা অফিসার এসআই সায়দুয়েল। ছবি: সংগৃহীত

LENS ASIA

শরীয়তপুরের ডাকাতির ঘটনায় উদ্ধার ৫২ মোবাইল ফোন রহস্যজনক ভাবে উধাও। পুলিশ মালখানায় আলামত লোপাটের অভিযোগ উঠেছে, প্রশ্নের মুখে পড়েছে কর্তৃপক্ষ।

২০২৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শরিয়তপুরে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো (বিএটি)–এর একটি ডিলার পয়েন্টে সংঘটিত হয় দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা। ঘটনার পরপরই সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ, মোবাইল লোকেশন ট্র্যাকিং এবং তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ডাকাত দলের তিন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় প্রায় ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা, একটি পিকআপ ভ্যান, ডাকাতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং ৫২টি নামি-দামি মোবাইল ফোন—যার অধিকাংশই স্মার্টফোন।

তবে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ঘটনার এক বছর পেরিয়ে গেলেও উদ্ধারকৃত ওই ৫২টি মোবাইল ফোনের কোনো হদিস নেই। আজ পর্যন্ত একটি ফোনও প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।

মালখানায় জমা, এরপর রহস্যজনক উধাও

ডাকাতি মামলার তৎকালীন তদন্ত কর্মকর্তা পালং মডেল থানার ওসি (তদন্ত) মো. মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া এক ডাকাতের বাসা থেকে মোবাইল ফোনগুলো উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার শেষে পালং মডেল থানার তৎকালীন ওসি হেলাল উদ্দিন এবং নড়িয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড. আশিক মাহমুদের উপস্থিতিতে ফোনগুলো থানার মালখানা অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর সায়েদুল ইসলামের কাছে জমা দেওয়া হয়।

পুলিশি বিধি অনুযায়ী, উদ্ধারকৃত আলামত মালখানায় গ্রহণের পর তা রেজিস্টারভুক্ত করা, সিলগালা করা এবং আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সংরক্ষণ ও হস্তান্তর করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু এই ঘটনায় সেই নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না—তা নিয়ে দেখা দিয়েছে গুরুতর প্রশ্ন।

সংখ্যার গরমিল, বক্তব্যে অসঙ্গতি

অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, মালখানায় জমা দেওয়া ৫২টি মোবাইল ফোনের মধ্যে অন্তত ৩০টির বেশি নামি-দামি স্মার্টফোন আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে তৎকালীন ওসি (তদন্ত) মো. মাসুদুর রহমান বলেন, “আমি নিজ হাতে ৫২টি মোবাইল ফোন মালখানা অফিসারের কাছে জমা দিয়েছি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের সুযোগ নেই।”
পালং মডেল থানার সাবেক ওসি হেলাল উদ্দিনও ফোন উদ্ধার এবং মালখানায় জমার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তবে মালখানা অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর সায়েদুল ইসলামের বক্তব্যে দেখা যায় চরম অসঙ্গতি। প্রথমে তিনি মোবাইল ফোন উদ্ধারের বিষয়টি অস্বীকার করেন। পরে বক্তব্য পরিবর্তন করে বলেন, ৪৫ থেকে ৪৮টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছিল। অন্যদিকে, মামলার পরবর্তী তদন্ত কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টর জব্বার হোসেন জানান, তিনি মালখানা থেকে মাত্র ১০ থেকে ১৫টি মোবাইল ফোন দেওয়ার প্রস্তাব পান। যা অন্যান্য তদন্ত কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে স্পষ্টতই সাংঘর্ষিক।

ফোনগুলোর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে মালখানা অফিসার দাবি করেন, “ফোনগুলো এখনো মালখানায় আছে। মালিকানা নিশ্চিত না হওয়ায় এবং বেশিরভাগ ফোন নষ্ট

থাকায় হস্তান্তর করা হয়নি।”

বিশেষজ্ঞদের মতে যুক্তি অগ্রহণযোগ্য

আইন ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই যুক্তি টেকসই নয়। কারণ প্রতিটি মোবাইল ফোনের একটি স্বতন্ত্র আইএমইআই নম্বর থাকে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের সহায়তায় খুব সহজেই মালিক শনাক্ত করা সম্ভব।

অথচ এক বছরেও মালিক শনাক্তে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মামলার দ্বিতীয় তদন্ত কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টর জব্বার হোসেন জানান, তিনি ফোনগুলো যাচাই করে মালিকদের কাছে হস্তান্তরের উদ্যোগ নিলে মালখানা অফিসার গড়িমসি করেন। পরে মাত্র ১০–১৫টি ফোন দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি আরও জানান, ফোনগুলো মামলার জব্দ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় তিনি সেগুলো গ্রহণ করেননি।

এতে প্রশ্ন আরও গভীর হয়েছে—যদি ফোনগুলো জব্দ তালিকাভুক্ত না হয়, তবে সেগুলো মালখানায় গেল কীভাবে, আর পরে গেলই বা কোথায়?

নীরব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ

এ ঘটনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নড়িয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড. আশিক মাহমুদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

পুলিশি মালখানায় যদি উদ্ধারকৃত আলামতই নিরাপদ না থাকে, তবে সাধারণ মানুষ আইনের আশ্রয় নিতে কতটা নিরাপদ বোধ করবে—এই প্রশ্ন এখন জনগনের

LENS ASIA